সাধারণের মুশকিল আসান

পকসো আইন নিয়ে কিছু কথা

শেষ পর্ব

বেশ কিছুদিন ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজের নানা প্রান্তে শিশুদেরওপর নির্মম অত্যাচার চলছে। সমাজের একটা অংশই শিশুদের ওপর সেই অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত। পাঠকদের মধ্যে অনেকেই এই বিভাগের কাছে জানতে চেয়েছেন যে, শিশুদের ওপর এধরনের অত্যাচারের ঘটনা ঘটলে আইন বা বিচারব্যবস্থা কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে। বিশেষ করে বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকারা এব্যাপারে বেশি করে জানতে চেয়েছেন। তারই প্রেক্ষিতে জলপাইগুড়ি জেলা আইনি পরিসেবা কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন সচিব চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য শিশুদের যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষা প্রদানকারী আইন বা পকসো আইন এবং তার পর্যালোচনা করেছেন সাধারণের মুশকিল আসান বিভাগে।

এই আইনি বর্ণিত কোনো অপরাধ করার ক্ষেত্রে যদি ব্যক্তি সহযোগিতা বা সাহায্য করে তবে সেই ব্যক্তির এই অপরাধের জন্য যে সাজা নির্ধারণ করা হয়েছে সেই সাজা হবে। অর্থাৎ কোনো অপরাধের সাজার ক্ষেত্রে মূল অপরাধী ও তার সহযোগী দুজনে একই সাজা পাবে। (Section-17) এ থেকে মনে হতে পারে যে সহযোগীকে মূল অপরাধীর সমান সাজা দেওয়াটা ঠিক নয়। কারণ সাধারণভাবে মনে হয়, যে অপরাধ করেছে তার অপরাধের গুরুত্ব তার সহযোগীর চেয়ে বেশি, কিন্তু এই আইনে বর্ণিত অপরাধগুলি যেহেতু একটি বিশেষ শ্রেণির যেখানে শিশুদের শোষণ, নির্যাতন ও তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের বিষয়টি জড়িত তাই এখানে অপরাধী ও সহযোগীকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয় এবং তা ১৬ ধারায় সহযোগী বা সহযোগিতা করা বলতে কী বোঝানো হয়েছে সেটা দেখলেই বোঝা যাবে।

অপরাধের সহযোগিতা করা (Abetment of an offence) (Section-16) ঃ

এই আইনে কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধে সাহায্য বা সহযোগিতা করেছে বলে ধরা হবে যদি সেই ব্যক্তি অন্য কাউকে অপরাধ করতে প্ররোচিত বা সাহায্য করে, অথবা এক বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে উক্ত অপরাধ করার ষড়যন্ত্র করে, অথবা নিজের ইচ্ছায় কোনো অপরাধ করার কাজে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে বা বেআইনিভাবে নিষ্ক্রিয় থেকে এ ধরনের অপরাধ ঘটতে সাহায্য করে। এখানে মনে রাখতে হবে যে ষড়যন্ত্র করার বিষয়টি যেহেতু অপরাধীর মনের ভেতরের বিষয়, যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না তাই ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো কাজ করা বা বেআইনি নিষ্ক্রিয়তা ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে ধরা হবে না।

কোনো ব্যক্তি তার পদাধিকার বলে বা কোনো আইনের মাধ্যমে যদি কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সেই পদক্ষেপ না নেয় তবে তার এই নিষ্ক্রিয়তাকে বেআইনি নিষ্ক্রিয়তা বলা হয়।

কোনো কাজ হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ভুল তথ্য দেয় বা কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য, যা সে প্রকাশ করতে বাধ্য ছিল, তা গোপন করে, তাহলে সেই ব্যক্তি অপরাধের প্ররোচনাকারী হিসাবে গণ্য হবে। কোনো শিশুকে জোর করে, তাকে অপহরণ করে বা তার ওপর কোনোভাবে চাপ সৃষ্টি করে, প্রতারণা করে বা নিজের পদের অপপ্রয়োগ করে বা কোনো ব্যক্তিকে টাকাপয়সা প্রদান অথবা অন্য কোনো সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে কেউ যদি কোনো শিশুকে কাজে লাগায় বা নিজের কাছে রাখে বা তাকে পাচার করে তাহলে তাকেও অপরাধে সহযোগিতা করা বলে গণ্য করা হবে। (Section-16)

অপরাধের প্রচেষ্টা (Section-18) ঃ

এই আইনে শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ নিজে করার চেষ্টা করা বা অপর কাউকে দিয়ে এ জাতীয় অপরাধ ঘটানোর চেষ্টা করা হলে যে ব্যক্তি এই ধরনের প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকবে তার এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে সাজা নির্ধারণ করা হয়েছে সেই সাজার অর্ধেক মেয়াদি সাজা হতে পারে, অর্থাৎ কোনো অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ডের সাজা থাকলে সেই অপরাধ করার চেষ্টা করলে অপরাধীর আড়াই বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা আছে সেখানে প্রচেষ্টাকারীর কি সাজা হতে পারে ? সাধারণভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলতে অপরাধী যতদিন বেঁচে থাকবে সেই সময়কাল বোঝায়, যদিও ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৫৪ ধারা অনুযায়ী সরকার চাইলে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিকে ১৪ বছর পরে ছেড়ে দিতে পারে। সাধারণত জেলে (যার এখন পরিবর্তিত নাম সংশোধনাগার) থাকার সময় ভালো ব্যবহার করলে এবং কারা কর্তৃপক্ষের কোনো খারাপ রিপোর্ট না থাকলে ১৪ বছর পরে বেশিরভাগ কয়েদিকেই আইনের এই সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে, তাই সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে ১৪ বছরের কারাদণ্ড, কিন্তু সে ধারণাটি ঠিক নয়। এই আইনের ২ (২) ধারায় বলা হয়েছে যে, যে বিষয়গুলির নির্দিষ্ট সংজ্ঞা এই আইনে দেওয়া হয়নি সেগুলির ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৫৭ ধারা অনুযায়ী সাজার মেয়াদের ভগ্নাংশ হিসাব করার ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ২০ বছরের কারাদণ্ড হিসাবে গণ্য করতে হবে তাই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টাকারীর ১০ বছরের কারাদণ্ড হবে।

অভিযোগের নথিভুক্তিকরণ ও বিচার পদ্ধতি ঃ

শিশুদের ওপর হওয়া যৌন নির্যাতনের ঘটনা রিপোর্ট করতে হয় স্পেশাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিটের কাছে। প্রতিটি জেলায় এই ইউনিট গঠন করা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। যেসব জায়গায় এই ইউনিট গঠন হয়নি সেখানে থানাতেই অভিযোগ জানাতে হবে। জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন) অ্যাক্টের ১০৭ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি থানায় কমপক্ষে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেকটরের পদমর্যাদার সমতুল পর্যায়ের একজন অফিসারকে শিশুদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের বিরুদ্ধে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্বে রাখতে হবে। সাধারণত প্রতিটি থানার সেকেন্ড অফিসারকে এজাতীয় অপরাধ নথিভুক্ত করার দায়িত্বে রাখা হয়। এই ইউনিট বা যে অফিসারের ওপর এই দায়িত্ব দেওয়া থাকে তাকে যে কাজ করতে হয় বা দায়িত্ব পালন করতে হয় তা নীচে বর্ণনা করা হল।

স্পেশাল জুডিশিয়াল পুলিশ ইউনিট (এসজেপিইউ)–এর পালনীয় কর্তব্য ঃ

১। অপরাধের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর রেকর্ড করতে হবে এবং তার একটি কপি যিনি খবর দিয়েছেন তাকে দিতে হবে।

২। অপরাধের খবর প্রদানকারীর কাছে নিজের নাম, পদমর্যাদা, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং যে অফিসার তার কাজকর্ম তদারক করেন তার নাম, পদমর্যাদা, ঠিকানা, ফোন নম্বর জানাতে হবে।

৩। অপরাধের খবর পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনার রিপোর্ট চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি) এবং স্পেশাল কোর্টকে পাঠাতে হবে। যেখানে স্পেশাল কোর্ট নেই সেখানে সেশন কোর্টকে এবিষয়ে জানাতে হবে। যদি শিশুর জন্য কোনো সাহায্যকারী বা সাপোর্ট পার্সন নিয়োগ করা হয় তাহলে সে বিষয়টিও স্পেশাল কোর্টকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে হবে।

৪। শিশুর প্রয়োজন হলে তার জন্য আপৎকালীন চিকিৎসার (ইমারজেন্সি মেডিকেল কেয়ার) ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। শিশুটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার (ফরেন্সিক টেস্ট) জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এবং তার স্যাম্পল দ্রুততার সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। শিশু ও তার বাবা–মাকে বিভিন্ন সাপোর্ট সার্ভিসের বিষয়ে অবগত করাতে হবে এবং যারা এ ধরনের সাহায্য প্রদান করে থাকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে সহায়তা করতে হবে।

৭। শিশু ও তার বাবা–মাকে তাদের আইনি সহায়তা ও আইনজীবী পাওয়ার অধিকারের বিষয়ে জানাতে হবে।

৮। যদি শিশুটি যে বাড়িতে বসবাস করছে সেই বাড়ির অপর কোনো বাসিন্দা দ্বারা শিশুটির ক্ষতিসাধনের যুক্তিপূর্ণ সম্ভাবনা থাকে বা শিশুটি অনাথ, পরিত্যক্ত অথবা চাইল্ড কেয়ার ইন্সটিটিউটে বসবাসকারী হয়, তাহলে এ ধরনের ঘটনার সংবাদ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিশুটিকে সিডব্লিউসির কাছে উপস্থিত করাতে হবে এবং তার সঙ্গে শিশুটির যত্ন ও নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে কিনা তার কারণ জানিয়ে এ বিষয়টির বিশদ মূল্যায়নের জন্য সিডব্লিউসি–কে অনুরোধ জানাতে হবে।

৯। শিশুটিকে অথবা তার বাবা–মা, অভিভাবক অথবা সাপোর্ট পার্সন (যেখানে প্রযোজ্য)–কে অপরাধীর গ্রেফতার সহ কেসটির সর্বশেষ পর্যায় সম্পর্কে জানাতে হবে।

১০। শিশুটিকে ভিক্টিমস কমপেনসেশন স্কিম সম্পর্কে জানাতে হবে।

১১। কোর্টে বিচারের নির্ঘণ্ট (শিডিউল), জামিন পদ্ধতি, আসামি বন্দি আছে না ছাড়া পেয়েছে, চার্জশিট দাখিল হয়েছে কিনা, দোষী ব্যক্তির ওপর আরোপিত সাজা, ইত্যাদি বিষয় শিশুটিকে বা তার বাবা–মা, অভিভাবক বা যে ব্যক্তির উপর শিশুটির বিশ্বাস ও নির্ভরতা রয়েছে তাকে জানাতে হবে।

১২। শিশুটির বাড়িতে বা সে যেখানে বসবাস করছে সেখানে তার বয়ান রেকর্ড করতে হবে। বয়ান রেকর্ড করার সময় পুলিশ অফিসার ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় থাকবেন না। যতদূর সম্ভব সাব ইনস্পেকটরের পদমর্যাদার নীচে নয় এমন কোনো মহিলা অফিসার দ্বারা শিশুর বয়ান রেকর্ড করতে হবে।

১৩। কোনো অবস্থাতেই কোনো শিশুকে রাতে থানায় রাখা যাবে না।

১৪। বিশেষ আদালতের নির্দেশ ছাড়া শিশুর পরিচিতি যাতে পাবলিক মিডিয়ার কাছে না পৌঁছায় তা পুলিশ অফিসারকে নিশ্চিত করতে হবে।

চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি) ঃ

জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন) অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি থাকা বাধ্যতামূলক। এই কমিটি শিশুদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার কাজে নিয়োজিত। পিওসিএসও আইন অনুযায়ী এই কমিটির দায়িত্ব নিম্নরূপ।

১। এসজেপিইউর কাছ থেকে পাওয়া খবরের পরিপ্রেক্ষিতে বা নিজস্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে তদন্ত ও বিচারকালে শিশুটির সহায়তার জন্য সিডব্লিউসি শিশুটিকে একজন সাহায্যকারী (সাপোর্ট পার্সন) প্রদান করতে পারে।

২। শিশু, তার বাবা–মা, অভিভাবক বা যে ব্যক্তির উপর শিশুটির বিশ্বাস ও নির্ভরতা রয়েছে তার অনুরোধের ভিত্তিতে সাহায্যকারীর পরিসেবা সমাপ্ত করে দেওয়া যেতে পারে। এজন্য শিশুটির কোনো কারণ দর্শানোর প্রয়োজন নেই। পরিসেবা সমাপ্তির বিষয়টি স্পেশাল কোর্টকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

চিকিৎসকের দায়িত্ব ঃ

এই আইনে শিশুটিকে যে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে সেই চিকিৎসকের কর্তব্য ও দায়িত্ব এই আইনে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকের কর্তব্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। আপৎকালীন চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা দেওয়ার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ, কোনো আইনি দস্তাবেজ বা অপর কোনোরকম নথি উপস্থিত করার দাবি করা যাবে না।

২। আপৎকালীন চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার সময় ক্ষত, আঘাত, যৌন সম্পর্কের ফলে ছড়ায় এমন রোগ (সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ), এইচআইভি ইত্যাদির প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

৩। আক্রান্ত শিশুটি মেয়ে হলে তার পরীক্ষা মহিলা চিকিৎসক করবেন।

৪। শিশুটির বাবা–মা বা যে ব্যক্তির উপর শিশুটির বিশ্বাস ও নির্ভরতা রয়েছে তাদের উপস্থিতিতে শিশুর ডাক্তারি পরীক্ষা করতে হবে। যদি এরকম কোনো ব্যক্তি না পাওয়া যায় তবে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান দ্বারা মনোনীত কোনো মহিলার উপস্থিতিতে পরীক্ষা করতে হবে।

ডাক্তাররা যাতে শিশুদের পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে এই আইনে বর্ণিত অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে না পারে তার জন্য এই আইনের ৪১ ধারায় বলা হয়েছে যে, শিশুটির অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে যদি তার ডাক্তারি পরীক্ষা বা চিকিৎসা করা হয় তাহলে তা এই আইনে বর্ণিত অপরাধের আওতায় আসবে না।

ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট (ডিসিপিইউ) ঃ

জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন) অ্যাক্টের ১০৬ ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিটি রাজ্যে রাজ্য সরকারকে একটি চাইল্ড প্রোটেকশন সোসাইটি গঠন করতে হবে এবং প্রতিটি জেলায় শিশুদের সমস্যা নিরসনের জন্য একটি করে ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট গঠন করতে হবে। পিওসিএসও আইন অনুযায়ী এই ইউনিটকে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। বিশেষ শিক্ষাবিদ (স্পেশাল এডুকেটর) দোভাষী (ইনটারপ্রিটার), অনুবাদক (ট্রান্সলেটর) এদের নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের বিশদ তথ্য সংবলিত রেজিস্টার রক্ষণ করা ডিসিপিইউর কর্তব্য। এই রেজিস্টারটি পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট অথবা স্পেশাল কোর্ট চাইলে তাদের পর্যবেক্ষণের জন্য দিতে হবে।

২। 'জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন' আইনের ৬১ ধারা অনুযায়ী গঠিত রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে বিশেষ শিক্ষাবিদ, দোভাষী, অনুবাদক বা বিশেষজ্ঞের পরিসেবা প্রদানের দায়িত্ব ডিসিপিইউর।

৩। স্পেশাল কোর্ট নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকা আদালতের নির্দেশের প্রতিলিপি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া।

বিশেষ আদালত ঃ

এই আইনটি যেহেতু একটি অসুরক্ষিত শ্রেণির সুরক্ষা এবং তাদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তাই এই আইন সংক্রান্ত অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত স্থাপন করার কথা এই আইনে বলা হয়েছে। এই আইনের বিচারের কর্তব্য ও দায়িত্ব সাধারণ বিচার ব্যবস্থার থেকে আলাদা। বিশেষ আদালতে এই আইন সংক্রান্ত বিচার পরিচালনার সময় বিচারককে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১। শিশুর পরিবারের লোক, আত্মীয়, অভিভাবক বা বন্ধুকে আদালতে উপস্থিত হতে দিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

২। শিশুটির সাক্ষ্যগ্রহণের সময় সরকারি আইনজীবী বা অভিযুক্তের আইনজীবী তাদের প্রশ্ন বিচারককে জানাবেন এবং বিচারক সেই প্রশ্ন শিশুটিকে করবেন।

৩। শিশুর সম্ভ্রম যাতে রক্ষিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ আদালতকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং দেখতে হবে যাতে শিশুটির আক্রমণাত্মক জেরার সম্মুখীন না হয় বা তার চরিত্র নিয়ে অবমাননা না করা হয়। প্রয়োজনবোধে বিশেষ আদালত বারবার বিরতি দিতে পারে।

৪। শিশুর পরিচিতি যাতে প্রকাশ না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর স্বার্থে প্রয়োজনবোধে লিখিত কারণ দর্শিয়ে আদালত তার পরিচিতি প্রকাশ করতে পারে।

৫। শিশুর বয়স সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন উঠলে বিশেষ আদালত সে প্রশ্নের মীমাংসা করবে।

৬। কগনিজেন্স নেওয়ার ৩০ দিনের ভেতর শিশুর সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পূর্ণ করতে হবে। যদি তা না হয় তবে তার কারণ নথিবদ্ধ করতে হবে।

৭। মামলার বিচার রুদ্ধদ্বার কক্ষে শিশুর বাবা–মা বা যে ব্যক্তির উপর শিশুটির বিশ্বাস ও নির্ভরতা রয়েছে তাদের উপস্থিতিতে করতে হবে।

৮। শিশুটি যাতে আসামিকে দেখতে না পায় কিন্তু আসামি শিশুর বক্তব্য শুনতে পায় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। প্রয়োজনবোধে বিশেষ আদালত শিশুর সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য কমিশন গঠনের নির্দেশ দিতে পারে।

১০। কগনিজেন্স নেওয়া অর্থাৎ মামলাটিকে বিচারের জন্য গ্রহণ করার একবছরের ভেতর মামলার নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতে হবে।

১১। উপযুক্ত ক্ষেত্রে আদালত আক্রান্ত শিশুর তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে।

১২। যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে বিশেষ আদালত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা আক্রান্ত শিশুটির পক্ষে করা আবেদনের ভিত্তিতে আসামী দোষী সাব্যস্ত হোক বা না হোক বা যেখানে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা বা তার খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয়নি অথচ শিশুটির কোনো ক্ষতি বা আঘাত প্রাপ্তি ঘটেছে এরকম ক্ষেত্রে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিতেপারে। এই ধরনের আদেশের ৩০ দিনের ভেতর সরকারকে ভিক্টিমস কমপেনসেশন ফান্ড বা এ জাতীয় অন্য কোনো তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা আক্রান্ত শিশুটিকে প্রদান করতে হবে। (রুল ৭ অফ পিওসিএসও রুলস, ২০১২)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় অপরাধীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারীপক্ষের এবং অপরাধীকে প্রমাণ করতে হয় না যে সে নিরপরাধ, কিন্তু এই আইনের ২৯ ধারা অনুযায়ী ৩, ৫, ৭ ও ৯ ধারার অপরাধের ক্ষেত্রে আদালত অনুমান করে নিতে পারে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি অপরাধ করেছে। এক্ষেত্রে আসামির ওপর সে যে এ ধরনের অপরাধ করেনি বা অভিযোগ ভিত্তিহীন তা প্রমাণের দায়িত্ব বর্তায়।

রাজ্য সরকারকে সরকারি গেজেটে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রতিটি বিশেষ আদালতে এই আইন সংক্রান্ত বিচার পরিচালনার জন্য বিশেষ সরকারি অভিশংসক (স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর) নিয়োগ করতে হবে।

সাধারণ মানুষের আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য বহুক্ষেত্রে অহেতুক মামলা হয়। আবার অনেক সময় জ্ঞানের অভাবে মানুষ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বহুক্ষেত্রে তাদের অজানা থেকে যায় সরকারের তরফে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য কী কী প্রকল্প রয়েছে বা সরকারি সাহায্য পেতে কার কাছে বা কোথায় যেতে হবে, নিখরচায় আইনি পরিসেবা কারা পাবেন, সেই পরিসেবা পেতে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবেন, যদি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত বা পুরসভা জনপরিসেবামূলক কাজ না করে তাহলে আপনি কী করতে পারেন, অথবা সারা জীবন চাকরি করে, চাকরির শেষ প্রান্তে এসে জানতে পারলেন আপনার পিএফ সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকা। কী করবেন তখন ? আমাদের সমাজে মহিলাদের অবাধ ও নিরাপদে জীবনযাপন করতে সমাজ কী ব্যবস্থা নিয়েছে, ভারতীয় দণ্ডবিধিতে মহিলাদের সুরক্ষা প্রদানকারী ধারাগুলি কী কী এবং কীভাবে তার প্রয়োগ করা যায়–এই সব সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আপনাদের প্রিয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ শুরু করেছে এক নতুন বিভাগ– 'সাধারণের মুশকিল আসান।' সেখানে আপনাদের চাকরি সংক্রান্ত, ব্যক্তিগত সমস্যা, এলাকার সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশিকা পাবেন। সমস্যা নিয়ে আইনি পাঠান– আসান, পরামর্শ পেতে চিঠি সাধারণের মুশকিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি — এই ঠিকানায়।